বিজ্ঞানময় কিতাব

অভিজিৎ রায়

" মূর্খরা সব শোন, মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোন।" -নজরুল

১

এই প্রবন্ধটির সূচনা হয়েছিল একটি নির্দোষ ই-মেইলের জবাব দিতে গিয়ে। বছর সাতেক আগে আমি তখন সবে বাংলাদেশ থেকে পাড়ি জমিয়েছি বাইরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে । বিনা পয়সায় ইন্টারেনেট ব্যবহারের আমেজ সামলাতে সময় লাগছে। কুয়োর ব্যাঙ-কে কুয়ো থেকে তুলে সমুদ্রে ছেড়ে দিলে যেমন দশা হয় তেমনি দশা তখন আমার। কম্পিউটার নামের চার কোনা বাক্সের মাঝে জ্ঞানের অবারিত দুয়ার। আমি নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে পড়ে রইলাম সমুদ্র সিঞ্চনে । এমনি এক সময় সদ্য পরিচিত এক ভদ্রলোকের পাঠানো এক ই-মেইলে এক ওয়েব-সাইটের ঠিকানা পেলাম । ঠিকানাটা আসলে একটা অন-লাইন পত্রিকার। খুব যে আগ্রহ নিয়ে গেলাম তা নয়। কিন্তু গিয়ে অবাকই হলাম । পড়লাম বেশ কিছু লেখকের তথ্য-বহুল উঁচুমানের লেখা। অজানা অচেনা পত্রিকায় এমন যুক্তিবাদী ইহজাগতিক লেখা ? তাও আবার লিখছে কিছু সাহসী বাংগালীরা । সত্যিই অবাক করার মত ব্যাপার । পরবর্তীতে এদের অনেককে নিয়ে আমি 'মুক্তমনা' (www.mukto-mona.com) নামে একটি প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী আন্তর্জাল আলোচনাচক্র গড়ে তুলি। প্রবাসী বাঙ্গালীরা যারা আন্তর্জাল আলোচনাচক্র গুলি সম্বন্ধে একটু-আধটু খোঁজ খবর রাখেন, তারা সবাই একনামে মুক্তমনাকে চেনেন। কারণ অনেকেই মনে করেন যে, চলমান ধারার বিপরীতে সবময়ই মুক্তমনা ভিন্নকথা শোনায়। ধমার্ন্ধতা আর সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে অনেকের কাছেই মুক্তমনা আজ এক চলমান বহ্নিশিখা, ঘোর অমানিশায় পথ দেখানো এক আলোকবর্তিকা। গতবছর (২০০৭) সালে আন্তর্জালে মানবিকতা, মুক্তবুদ্ধি এবং বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের স্বীকৃতি স্বরূপ মুক্তমনাকে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মৃতি পদকে ভুষিত করেছে। মুক্তমনার ইতিহাস এক অনন্য ইতিহাস। এর কথা আপাতত: থাকুক। তবে এই প্রবন্ধে বেশ ক'টি জায়গায় মুক্তমনার প্রসংগ অনিবার্যভাবে এসে পড়বে বলেই এ প্রসংগটির অবতারণা।

বলছিলাম আসলে সেই অনলাইন পত্রিকাটির কথা। সে পত্রিকাটিতে সকলেই যে ধর্মের শিকল থেকে মুক্ত হয়ে প্রগতিশীল লেখা লিখতেন বা লিখছেন তা কিন্তু নয়। এক ভদ্রলোকের কথা খুব-ই মনে পড়ছে। এক পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক। উনি সবসময়ই একটি বিশেষ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব খুঁজতেন। এই ফ্যাশনটা ইদানিংকালে বাংলাদেশী শিক্ষিত মুসলমানদের ভেতরে প্রকট আকারে চোখে পড়ছে। বিশেষতঃ দুই বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলী এবং কেইথ মূরের 'অবিস্মরণীয়' অবদানের পর (ইদানিং সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে তুরস্কের হারুন ইয়াহিয়া নামের আরেক ছদ্ম-বিজ্ঞানী)। আজ তাঁরা ১৪০০ বছর আগের লেখা ধর্মগ্রন্থের মধ্যে 'বিগ ব্যাং' খুঁজে পান, মহাবিশ্বের প্রসারণ খুঁজে পান, মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ খুঁজে পান, অণু-পরমাণু, ছায়াপথ, নক্ষত্ররাজি, শ্বেত বামন, কৃষ্ণগহ্বর, ভ্রুণ-তত্ত্ব, আপেক্ষিক তত্ত্ব, সুপার স্ট্রিং তত্ত্ব, সবই অবলীলায় পেয়ে যান। তো সেই ভদ্রলোকও বুকাইলী-মূরের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে কোরাণ যে কত 'সুপার সায়েন্টিফিক' বই, তা প্রমাণের জন্যে পাতার পর পাতা লিখে যেতে থাকলেন। কাঁহাতক আর পারা যায়! আমি অবশেষে তাঁর একটি লেখার প্রতিবাদ করবার সিদ্ধান্ত নেই। বলি, 'কি দরকার আছে এই হাজার বছর আগেকার কতকগুলি সূরার মধ্যে বিগ ব্যাং এর তত্ত্ব অনুসন্ধান করার? বিগ ব্যাং সম্বন্ধে জানতে চাইলে অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সের উপর গাদা গাদা বই বাজারে আছে; দেখুন না। ডিফারেনসিয়াল ইকুয়েশন সমাধানের জন্য তো আমাদের গণিতের বই-ই দেখতে হবে, কোরাণ-হাদিস চষে ফেললে কি এর সমাধান মিলবে?' এ যেন বারুদে আগুন লাগল। উনি এর পরদিন বিশাল মহাভারত আকারের মহাকাব্য লিখে বুঝিয়ে দিলেন ইসলাম এবং বিজ্ঞান বিষয়ে আমার জ্ঞান কত তুচ্ছ; কত নগণ্য, - কত অজ্ঞ, কত আহাম্মক আমি। এদিক-ওদিক-

সেদিক থেকে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত হাজির করে 'প্রমাণ' করে এক্কেবারে বুঝিয়ে পর্যন্ত দিলেন -দ্যাখ ব্যাটা - কোরাণে আধুনিক বিজ্ঞানের সবকিছুই আছে, কোরাণ কত 'বিজ্ঞানময়' কিতাব !

আমাকে লিখতেই হল। কি করব, আমার পিঠ যে তখন দেয়ালে ঠেকে গেছে। বললাম, একটু চোখ-কান খুলে যদি ধর্মগ্রন্থ গুলির ইতিহাসের দিকে তাকানো যায়, তাহলে বোঝা না যাওয়ার তো কথা নয় যে, সেই গ্রন্থগুলি লেখা হয়েছে বহু বছর আগে যখন মানুষের বিজ্ঞানের উপর দখল এবং জ্ঞান ছিল খুব ই সীমিত। এটা আশা করা খুব-ই বোকামি যে সেই সময়কার লেখা একটা বইয়ের মধ্যে বিগ-ব্যাং এর কথা থাকবে, সুপার স্ট্রিং এর কথা থাকবে, আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির কথা থাকবে। আধুনিক বিজ্ঞান নয়, ওই সমস্ত বইগুলিতে আসলে প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার চালচিত্রই ফুটে উঠেছে, তৎকালীন সমাজের মানুষের ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস , আশা আকাঙ্খার কথাই শুধু প্রকাশ পেয়েছে; এর এক চুলও বাড়তি কিছু নয়। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। কোরাণ যখন লিখিত হয়েছিল, তখনো গ্যালিলিও, ব্রুনো, কোপার্নিকাসের মত মনীষিরা এই ধরাধামে আসেন নি। তখনকার মানুষদের আসলে জানবার কথা নয় যে তাদের পরিচিত বাসভূমি - পৃথিবী নামক এই গ্রহটি যে সূর্য নামক নক্ষত্রের চারিদিকে ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে। কি করেই বা বুঝবে ? জন্মের পর থেকেই তারা সাদা চোখে সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে যেতে দেখেছে, আর রাত হলেই দেখেছে চাঁদ কে। এর পেছনে পদার্থবিজ্ঞানের কোন নিয়ম তারা কল্পনা করতে পারেনি, ভাবতো এগুলো বোধহয় ঈশ্বরের আইন। ঠিক সে কথাগুলিই কোরাণ-হাদিস-বেদ-বাইবেলে লেখা আছে। যেমন, ধরা যাক সূরা লুকমান (৩১:২৯) এর কথা। এখানে পরিষ্কার বলা আছে- ''আল্লাহ ই রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিবর্তন করেন, তিনিই সূর্য এবং চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন; প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট পথে আবর্তন করে''। সূর্য আর চাঁদের এই ভ্রমনের কথা শুধু সূরা লুকমানে নয়, রয়েছে সুরা ইয়াসিন (৩৬:৩৮), সূরা যুমার (৩৯:৫), সূরা রা'দ (১৩:২), সূরা আম্বিয়া (২১:৩৩), সূরা বাক্বারা (২:২৫৮), সূরা কা'ফ (১৮:৮৬), সূরা ত্বোয়াহায় (২০:১৩০)। কিন্তু সারা কোরাণ তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও পৃথিবীর ঘূর্ণনের স্বপক্ষে একটি আয়াতও মিলবে না। আল্লাহর দৃষ্টিতে পৃথিবী স্থির, নিশ্চল। সূরা নামলে (২৭:৬১) পরিস্কার বলা আছে - 'কে দুনিয়াকে বসবাসের স্থান করেছেন আর তার মধ্যে নদীসমূহ সৃষ্টি করেছেন আর এটিকে (পৃথিবী) স্থির রাখবার জন্য পাহাড়-পবর্ত সৃজন করেছেন ... '। একই ভাবে সূরা রূম (৩০:২৫), ফাত্বির (৩৫:৪১), লূকমান (৩১:১০), বাক্বারা (২:২২), নাহল (১৬:১৫) পড়লেও সেই এক-ই ধারণা পাওয়া যায় যে কোরাণের দৃষ্টিতে পৃথিবী আসলে স্থির। আমি ভদ্রলোককে সবিনয়ে বলেছিলাম, তিনি যদি সত্যই মনে করেন যে আধুনিক বিজ্ঞানের সকল তত্ত্ব ই কোরানে আছে, তাহলে শুধুমাত্র একটি আয়াত যদি কোরাণ থেকে দেখাতে পারেন যেখানে লেখা আছে 'পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে', অথবা নিদেন পক্ষে 'পৃথিবী ঘুরছে' - আমি তার সকল দাবী মেনে নেব। আরবীতে পৃথিবীকে বলে 'আরদ' আর ঘূর্ণন হছে 'ফালাক'। একটিমাত্র আয়াত আমি দেখতে চাই যেখানে 'আরদ' এবং 'ফালাক' পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে। উনি দেখাতে পারলেন না।

পারার কথাও নয়। কারণ কোরাণে এ ধরনের কোন আয়াত নেই। এর কারণটা আমি আগেই বলেছি। তখনকার যুগের মানুষেরা চিন্তা করে তো বের করতে পারেনি পৃথিবীর আহি¡ক আর বার্ষিক গতির কথা। টলেমীর পৃথিবী কেন্দ্রিক মতবাদকে মাথা থেকে সরিয়ে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদে মানুষের চিন্তা-ভাবনার উত্তোরণ ঘটেছে আসলে আরও অনেক বছর পরে। মুহম্মদের যুগে মানুষেরা এমনকি 'রাত্রিবেলা সূর্য কোথায় থাকে' - এই রহস্য ভেদ করতে গিয়ে 'গলদ-ঘর্ম' হয়ে উঠেছিল। তখনকার সময়ের মানুষেরা ভাবতো অনেক অনেক দূরে এমন একটি দেশ আছে যেখানে 'সূর্যদেব সত্য ই অস্ত যান '! চিন্তাশীল পাঠকেরা কোরাণের সেই বিখ্যাত সূরাটিতে চোখ বুলালেই বুঝবেন যেখানে জুল কারণাইনের উল্লেখ আছে-

''অবশেষে যখন সে সূর্যাস্তের দেশে পৌছাঁলো, সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবতে দেখল এবং সেখানে দেখতে পেল এক জাতি। আমি বললাম, 'হে জুল কারণাইন, হয় এদের শাস্তি দাও, না হয় এদের সাথে ভাল ব্যবহার কর'।'' (১৮:৮৬)

যারা কোরাণের মধ্যে অনবরত বিগ-ব্যাং, এবং সুপার স্ট্রিং তত্ত্বের খোঁজ করেন, তারা কি একবারের জন্যও ভাবেন না আল্লাহ কেমন করে এত বড় ভুল করলেন ! কিভাবে আল্লাহ ভাবলেন যে সূর্য সত্যই কোথাও না কোথাও অস্ত যায়? কোরাণ কি সত্যই 'মহা বিজ্ঞানময়' কিতাব নাকি ভ্রান্তি-বিলাস? অনেক পাঠকেরই হয়ত জানেন না যে মহানবী মুহম্মদকে শ্রেষ্টতম বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক বলে অভিহিত করা হয়, তিনি 'রাতে সূর্য কোথায় থাকে' - এই রহস্যের কি হাস্যকর ব্যাখ্যা

দিয়েছিলেন । এক সাহাবার (আবু যর) সাথে মতবিনিময় কালে মহানবী বলেছিলেন যে, রাত্রিকালে সূর্য থাকে খোদার আরশের নীচে। সারা রাত ধরে সূর্য নাকি খোদার আরশের নীচে থেকে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করে আর তারপর অনুমতি চায় ভোরবেলা উদয়ের (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬/৬০/৩২৬, ৪/৫৪/৪২১)* ।

যারা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলিকে বিজ্ঞানের মোড়কে পুরতে চান, তারা কি এই হাস্যকর আয়াতগুলির কথা জানেন না ? অবশ্যই জানেন। এবং জেনে শুনেই তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করেন। আর এখানেই আমার আপত্তি।

---

* *Volume 4, Book 54, Number 421:*

Narrated Abu Dhar:

The Prophet asked me at sunset, "Do you know where the sun goes (at the time of sunset)?" I replied, "Allah and His Apostle know better." He said, "It goes (i.e. travels) till it prostrates Itself underneath the Throne and takes the permission to rise again, and it is permitted and then (a time will come when) it will be about to prostrate itself but its prostration will not be accepted, and it will ask permission to go on its course but it will not be permitted, but it will be ordered to return whence it has come and so it will rise in the west. And that is the interpretation of the Statement of Allah: "And the sun Runs its fixed course For a term (decreed). that is The Decree of (Allah) The Exalted in Might, The All-Knowing." (36.38)

Volume 6, Book 60, Number 326:

Narrated Abu Dharr:

Once I was with the Prophet in the mosque at the time of sunset. The Prophet said, "O Abu Dharr! Do you know where the sun sets?" I replied, "Allah and His Apostle know best." He said, "**It goes and prostrates underneath (Allah's) Throne**; and that is Allah's Statement:--

'And the sun runs on its fixed course for a term (decreed). And that is the decree of All-Mighty, the All-Knowing....' (36.38)

Volume 6, Book 60, Number 327:

Narrated Abu Dharr:

I asked the Prophet about the Statement of Allah:--

'And the sun runs on fixed course for a term (decreed), ' (36.38) He said, "**Its course is underneath "Allah's Throne**." (Prostration of Sun trees, stars. mentioned in Qur'an and Hadith does not mean like our prostration but it means that these objects are obedient to their Creator (Allah) and they obey for what they have been created for).

এখানে একটি কথা বলে নেয়া প্রয়োজন যে, আমি কোরাণের আলোচনায় স্থির এবং নিশ্চল পৃথিবীর উল্লেখ করেছি বলে কেউ যেন না ভেবে থাকেন যে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলি এই দোষ থেকে মুক্ত। বস্তুত বাইবেল এবং বেদেও আমরা ঠিক এক ই ধরনের নিশ্চল পৃথিবীর ছবি দেখতে পাই।

বাইবেল থেকে পাঠকদের সামনে পৃথিবীর স্থিরতার স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ হাজির করছি-

> 'আর জগৎও অটল - তা বিচলিত হবে না' (ক্রনিকলস ১৬/৩০)
> 'জগৎ ও সুস্থির, তা নড়াচড়া করবে না।' (সাম ৯৩/১)
> 'তিনি পৃথিবীকে অনড় এবং অচল করেছেন' (সাম ৯৬/১০)
> 'তিনি পৃথিবীকে এর ভিত্তিমূলের উপর স্থাপন করেছেন, তা কখনো বিচলিত হবে না' (সাম ১০৪/৫) ইত্যাদি ।

একই ভাবে বেদেও রয়েছে -

> 'ধ্রুবা দৌধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে।' (ঋগ্বেদ দশম মন্ডল, ১৭৩/৪)
> অর্থাৎ, 'আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল, এ সমস্ত পর্বতও নিশ্চল'।

ঋগ্বেদের আরেকটি শ্লোকে রয়েছে -

> 'সবিতা যৈত্রঃ পৃথিবীমরন্যা-দ©ম্ভনে সবিতা দ্যামদৃং হত।' (ঋগ্বেদ দশম মন্ডল, ১৪৯/১)
> অর্থাৎ, 'সবিতা নানা যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীকে সুস্থির রেখেছেন - তিনি বিনা খুঁটিতে আকাশকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছেন।'

উপরের শ্লোকটি একটি বিশেষ কারণে আরো বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। এটি থেকে বোঝা যায়, বৈদিক যুগে মানুষেরা পৃথিবীকে তো স্থির ভাবতেন-ই, আকাশকে ভাবতেন পৃথিবীর ছাদ। তাঁরা ভাবতেন ঈশ্বরের অপার মহিমায় এই খুঁটিবিহীন ছাদ আমাদের মাথার উপরে ঝুলে রয়েছে। একই ধারণা আমরা কোরাণেও দেখতে পাই। সূরা লুকমানে (৩১:১০) আল্লাহর মহিমার বর্ণনা আছে এইভাবে-

> 'তিনিই খূঁটি ছাড়া আকাশকে ছাদ স্বরূপ ধরে রেখেছেন ...'

কিন্তু আজ এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে আমরা জানি, আকাশ কখনই পৃথিবীর ছাদ নয়। সামগ্রিকভাবে আসলে আকাশ বলেই তো কিছু নেই। আকাশ হচ্ছে আমাদের দৃষ্টির প্রান্তসীমা। আমাদের পৃথিবীতে বায়ুমন্ডল থাকার কারণে আমাদের চোখে আকাশকে নীল দেখায়। চাঁদে বায়ুমন্ডল নেই, তাই চাঁদের আকাশ কালো। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, 'মহাবিজ্ঞানময়' কিতাবগুলোতে এ ধরনের কোন বিজ্ঞানভিত্তিক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান তো আমরা পাই না। মানুষ কবে বড় হবে? ধর্মগ্রন্থগলো থেকে মুখ সরিয়ে কবে সত্যি সত্যিই একদিন বুঝতে শিখবে 'আকাশ' শব্দটার মানে? সুনীলের কবিতার 'একটা গাছ তলায় দাঁড়িয়ে' কবিতার কয়েকটি লাইন এ প্রসঙ্গে খুবই অর্থবহ -

> ' ... এতগুলো শতাব্দী গড়িয়ে গেল, মানুষ তবু ছেলেমানুষ রয়ে গেল
> কিছুতেই বড় হতে চায় না
> এখনো বুঝলো না 'আকাশ' শব্দটার মানে
> চট্টগ্রাম বা বাঁকুড়া জেলার আকাশ নয়
> মানুষ শব্দটাতে কোন কাঁটাতারের বেড়া নেই

ঈশ্বর নামে কোন বড় বাবু এই বিশ্ব সংসার চালাচ্ছেন না
ধর্মগুলো সব রূপকথা
যারা এই রূপকথায় বিভোর হয়ে থাকে
তারা প্রতিবেশীর উঠোনের ধুলোমাখা শিশুটির কান্না শুনতে পায় না
তারা গর্জন বিলাসী ... '

২

আমার নিবন্ধটি সেই অনলাইন পত্রিকাটি সহ অন্যান্য জায়গায় প্রকাশের পর বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া হয়। আমার এক ধার্মিক বান্ধবী ই-মেইলে জানায়, ''হতে পারে কোরাণে কোথাও বলা নাই যে 'পৃথিবী ঘুরছে'। কোরাণে তো কতকিছুই সোজাসুজি বলা নাই। যেমন, কোরানে তো এ কথাও বলা নাই যে 'পৃথিবী গোলাকার'। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে কোরাণের দৃষ্টিতে পৃথিবী সমতল ।''

উত্তরে আমি জানালাম, কোরাণের দৃষ্টিতে পৃথিবী সত্যই সমতল ! নিম্নোক্ত এই সূরাগুলি তার প্রমাণ -

' ... পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি (কার্পেটের মত) এবং ওতে পর্বত মালা সৃষ্টি করেছি ... ' (হিজ্বর ১৫:১৯)

'যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে (সমতল) শয্যা করেছেন এবং ওতে তোমাদের জন্য চলার পথ দিয়েছেন ...' (ত্বাহা ২০:৫৩, যুখরুখ ৪৩:১০)

' আমি বিস্তৃত করেছি (কার্পেটের মত) পৃথিবীকে এবং ওতে পর্বত মালা স্থাপন করেছি ... ' (ক্বাফ ৫০:৭)

'আমি ভূমিকে বিছিয়েছি, আর তা কত সুন্দর ভাবে বিছিয়েছি ... ' (ত্বর ৫২:৪৮)

'আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত ... ' (নূহ ৭১:১৯) ইত্যাদি।

উপরের আয়াতগুলি থেকে বোঝা যায়, পদার্থবিদরা যে ভাবে আজ গোলাকার পৃথিবীর ধারণা পোষণ করেন, কোরাণের পৃথিবী তার সাথে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমি এই প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত সূরা কাহাফ (১৮:৮৬) এর প্রতি আবারও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই যেখানে বলা আছে আল্লাহর এক বিশ্বস্ত বান্দা কাদামাটি পূর্ণ একটি নির্দিষ্ট স্থানে সূর্যকে ডুবতে দেখেছিলেন। একই সূরার ৯০ নং আয়াতে একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে সূর্যোদয়েরও বর্ণনা আছে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে আল্লাহ কেন ভাবলেন যে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান দরকার ? এর মধ্য থেকে একটি সত্যই বেরিয়ে আসে, আর তা হল কোরাণের গ্রন্থাকার পৃথিবীকে গোলাকার ভাবেননি, ভেবেছেন সমতল।

নামাজ পড়ার নির্দিষ্ট সময়ের কথা মাথায় রাখলে পরিস্কার বোঝা যায় প্রাচীন কালে মানুষেরা সমতল পৃথিবীর ধারণা থেকে একদমই বেরুতে পারেন নি। আমাদের বাঙ্গালী কৃষক-দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর 'সত্যের সন্ধান' বইতে খুবই পরিস্কারভাবে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন। এই সুযোগে সেটা আবার একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। ইসলামী শাস্ত্রে প্রত্যেকদিন পাঁচবার নামাজ পরার বিধান আছে। এই পাঁচবারের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ আছে, আবার কোন কোন সময়ে নামাজ পড়া

আবার নিষিদ্ধ। যেমন, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত অথবা মধ্যাহ্নে; নামাজ পড়ার কোন নিয়ম নেই। কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে আমরা জানি যে কোন স্থির মুহূর্তে বিভিন্ন দ্রাঘিমার উপর বিভিন্ন সময় দেখা দেয় এবং প্রতিমুহূর্তেই পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে নির্দিষ্ট উপাসনা চলতে থাকে। এর মানে কি? যেমন ধরা যাক, বরিশালে যখন সূর্যোদয় হচ্ছে, তখনও কলকাতায় সূর্য উঠেনি আর চট্টগ্রামে কিছুক্ষন আগেই সূর্য উঠে গেছে। কাজেই বরিশালে যখন ইসলামের দৃষ্টিতে নামাজ পড়া হারাম, তখন কলকাতা বা চট্টগ্রামে তা হারাম নয়। তা হলে নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনা নিষিদ্ধ করার কোন মানে আছে? যুক্তিবাদী আরজ আলী 'সত্যের সন্ধানে' বইতে একটি মজার প্রশ্ন করেছেন। ধরা যাক একজন লোক বেলা দেড়টায় জোহরের নামাজ পড়ে বিমানে চড়ে মক্কায় যাত্রা করলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি দেখলেন যে ওখানে তখনও দুপুর হয়নি। ওখানে জোহরের ওয়াক্তের সময় হলে কি তার আরেকবার জোহরের নামাজ পড়তে হবে? আপাতঃ নিরীহ এই প্রশ্নটির মধ্যেই কিন্তু উত্তরটি লুকিয়ে আছে। আরজ আলী নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন-

> 'এক সময় পৃথিবীকে স্থির আর সমতল মনে করা হত। তাই পৃথিবীর সকল দেশে বা সকল জায়গায় একই রকম সময় সূচিত হবে, বোধহয় এইরকম ধারণা থেকে ওই সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু এখন প্রমানিত হয়েছে যে, পৃথিবী গোল ও গতিশীল।'

আসলে আধুনিক জীবন-যাত্রার সাথে তাল মেলাতে পুরোন ধর্মীয় কানুন মানতে গিয়ে দেখা দিচ্ছে নানা জটিলতা। ভবিষ্যতে এই জটিলতা আরও বাড়বে। যেমন, কোন নভোচারী অথবা কোন বিমান চালক ১০৪১.৬৭ মাইল বেগে পশ্চিম দিকে বিমান চালালে সূর্যকে সবসময়ই তার কাছে গতিহীন বলে মনে হবে। অর্থাৎ বিমান আরোহীদের কাছে সকাল, দুপুর আর সন্ধ্যা বলে কিছু থাকবে না- সূর্য যেন স্থিরভাবে একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই অবস্থায় বিমান আরোহীদের নামাজ-রোজার উপায় কি? ভবিষ্যতে মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি যদি বসতি গড়তে হয়, তবে দেখা দেবে আরও এক সমস্যা। সেখানে প্রায় ছয় মাস থাকে দিন আর ছয় মাস থাকে রাত। সেখানে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা রাখা আর দিনে পাঁচ বার নামাজ পড়া কি আদৌ সম্ভব? এটি বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে, প্রাচীনকালে মানুষের সমতল পৃথিবী ব্যাপারে ভুল ধারণার কারণেই আজকের দিনে নিয়ম পালনে এই জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

এ ধরণের তথ্যগত ভুল কিংবা প্রাচীণ অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার নিদর্শন কোরাণে আরো আছে। ভ্রান্ত 'সমতল' পৃথিবীর ধারণা কিংবা 'অনড়' পৃথিবীর ধারণাই কেবল নয়, কোরাণে আছে অদৃশ্য 'শয়তান জ্বীন' এর উপস্থিতির উল্লেখ (৬:১০০, ৬:১১২, ৬:১২৮, ৬:১৩০, ৭:৩৮, ১১:১১৯, ১৫:২৭ ইত্যাদি), যাদের কাজ হচ্ছে একজনের উপর উপর আরেকজন দাড়িয়ে 'Exalted Assembly' তৈরি করা (৩৭:০৮) আর কানাকানি করে গোপন কথা শুনে ফেলা (৭২: ৮, ৩৭: ৬/১০) । এই অদৃশ্য শয়তান জ্বীনদের ভয় দেখানোর জন্য আল্লাহ আবার উল্কাপাত ঘটান (৭২: ৯, ৩৭:১০) বলে কোরাণে উল্লেখ করেছেন, সেজন্যই আমরা আকাশে উল্কাপাত ঘটতে দেখি। কিভাবে জুলকার্নাইন এক 'পঙ্কিল জলাশয়ে' সূর্যকে ডুবতে দেখেছেন, তার উল্লেখ যে কোরাণে আছে, তা তো এ প্রবন্ধে আগেই বলেছি। এ ধরণের ভুল আরো আছে। যেমন, বলা আছে স্পার্ম নাকি তৈরী হয় মেরুদন্ড এবং পাঁজরের মধ্যবর্তী জায়গা থেকে (৮৬:৬-৭); মাতা মেরী কে বর্ণনা করা হয়েছে অ্যারনের (মূসার বড় ভাই) বোন হিসেবে (১৯:২৮); ইত্যাদি। এগুলো সবই হাস্যকর রকমের ভ্রান্ত তথ্য।

পরস্পরবিরোধী বাণীও আছে ঢের। কয়েকটি আয়াত থেকে পাওয়া যায়, এই মহাবিশ্ব তৈরি করতে আল্লাহ সময় নিয়েছেন ছয় দিন (৭:৫৪, ১০:৩, ১১:৭, ৫০:৩৮, ৫৭:৪ ইত্যাদি), কিন্তু ৪১:৯-১২ থেকে জানা যায়, তিনি পৃথিবী তৈরি করতে ২ দিন সময় নিয়েছিলেন, এর পর এর মধ্যে পাহাড়-পর্বত বসাতে আর অন্যান্য আনুষঙ্গিক ইমারত তৈরী করতে আরো চার দিন, সবশেষে সাত আসমান বানাতে সময় নিয়েছেন আরো দু-দিন। সব মিলিয়ে সময় লেগেছে মোট আট দিন। কাজেই কোরান অনুযায়ী আল্লাহ মহাবিশ্ব বানিয়েছেন কয় দিনে - ছয় দিনে নাকি আট দিনে? পরস্পরবিরোধিতার আরো কিছু নমুনা দেখি। সুরা ৭৯:২৭-৩০ অনুযায়ী আল্লাহ 'হেভেন' বানিয়েছিলেন আগে, তারপর বানিয়েছিলেন পৃথিবী, কিন্তু অন্য কিছু আয়াতে আল্লাহ বলেছেন একেবারে উলটো কথা - অর্থাৎ, আগে পৃথিবী, পরে হেভেন (২:২৯ এবং ৪১: ৯-১২ দ্রঃ)। কখনো বলা হয়েছে আল্লাহ সব কিছু ক্ষমা করে দেন (৪: ১১০, ৩৯: ১৫৩) কিন্তু আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, তিনি সব কিছু ক্ষমা করেন

না (৪:৪৮, ৪:১১৬, ৪:১৩৭, ৪:১৬৮)। সুরা ৩: ৮৫ এবং ৫:৭২ অনুযায়ী ইসলাম ধর্মে যারা নিজেদের সমর্পন করেনি তারা সবাই দোজখে যাবে তা সে খ্রীষ্টান, ইহুদী, প্যাগান যেই হোক না কেন, কিন্তু আবার ২:৬২ এবং ৫:৬৯ অনুযায়ী, ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের সবাই দোজখে যাবে না। কখনো বলা হয়েছে মুহম্মদকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আছেন একহাজার জন ফেরেস্তা (৮:৯-১০) কখনোবা বলেছেন এই সাহায্যকারী ফেরেস্তাদের সংখ্যা আসলে তিনহাজার (৩: ১২৪, ১২৬)। কখনো আল্লাহ বলেছেন তার একটি দিন পার্থিব এক হাজার বছরের সমান (২২:৪৭, ৩২:৫), কখনোবা বলেছেন, তার দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান (৭০:৪)। মানব সৃষ্টি নিয়েও আছে পরস্পর-বিরোধী তথ্য। আল্লাহ কোরাণে কখনো বলেছেন তিনি মানুষ বানিয়েছেন পানি থেকে (২৫: ৫৪, ২৪:৪৫), কখনোবা জমাট রক্ত বা 'ক্লট' থেকে (৯৬: ১-২), কখনোবা কাদামাটি থেকে (১৫:২৬, ৩২:৭, ৩৮:৭১, ৫৫:১৪) আবার কখনোবা 'ডাস্ট' বা ধূলা থেকে (৩০:২০, ৩৫:১১) ইত্যাদি।

যা হোক, ইতিহাসের পাতাতে এবারে চোখ রাখা যাক। বারো শতকের বিখ্যাত আরবীয় বিজ্ঞানী ইবন-আল হাইথাম ধারণা করেছিলেন যে পৃথিবী সমতল নয়, বরং গোলাকার। তার সমস্ত কাজ সে সময় ধর্মবিরোধী বলে বাজেয়াপ্ত করা হয়, আর তাঁর সমস্ত বইও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই তো সেদিন - ১৯৯৩ সালে, সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ধ্বজাধারী ব্যক্তি শেখ আবদেল আজিজ ইবন বা'জ এই বলে একটি ফতোয়া জারি করেন -

> 'এই পৃথিবী সমতল। যারা এই সত্যটা মানে না তারা সকলেই নাস্তিক, শাস্তিই তাদের কাম্য।' কার্ল স্যাগানের 'The Demon-Haunted World' বইয়ে এই বিখ্যাত ফতোয়ার একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে।

হিন্দু পূরাণগুলির অবস্থাও তথৈবচঃ। নরসিংহ পূরাণের ১৬৯ পৃষ্ঠায় সমতল পৃথিবীর পরিস্কার বর্ণনা আছে। তাই গুজরাটে বারোদায় ' জাম্বুন্ডিপা' নামের একটি প্রতিষ্ঠান এখনো বৈদিক সমতল পৃথিবীকে 'বৈজ্ঞানিকভাবে' প্রমান করার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

হিন্দু পূরাণগুলির অবস্থাও তথৈবচঃ। নরসিংহ পূরাণের ১৬৯ পৃষ্ঠায় সমতল পৃথিবীর পরিস্কার বর্ণনা আছে। তাই গুজরাটে বারোদায় ' জাম্বুন্ডিপা' নামের একটি প্রতিষ্ঠান এখনো বৈদিক সমতল পৃথিবীকে 'বৈজ্ঞানিকভাবে' প্রমান করার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৯৯ সালের ১৫ ই সেপ্টেম্বর কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টিম মিলার দাবী করলেন যে, 'বাইবেল অনুযায়ী, পৃথিবীর চারটি প্রান্ত আছে।' এবং তিনি আরও দাবী করলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন পৃথিবী আসলে হয় চতুর্ভুজ আকৃতির অথবা আয়তাকার। আসলে কোরাণ, বাইবেল আর বেদের মত ধর্মগ্রন্থে লেখা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কিছু মানুষ এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও মনে করে পৃথিবী গোলাকার নয়, সমতল। তারা 'আন্তর্জাতিক সমতল পৃথিবী সমিতি' (International Flat Earth Society[†]) এবং 'আন্তর্জাতিক চতুর্ভূজাকার পৃথিবী সমিতি' (The International Square Earth Society[‡]) এ ধরনের হাস্যকর সমস্ত নামে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলেছে যাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে পৃথিবীবাসীদের বোঝানো যে, বিজ্ঞান যাই বলুক না কেন, পৃথিবী কিন্তু সমতল!

আবারও ফিরে আসি বিজ্ঞানময় কিতাবের জগতে। ফিরে আসতেই হয় বারে বারে- বুকাইলী, হারুন ইয়াহিয়া আর মুর-দের কল্যাণে। সোজা হয়ে প্রশ্নটার মুখোমুখি দাঁড়াতেই হয় অবশেষে- 'সত্যই কি কোরাণ অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত আর মহা-বিজ্ঞানময় এক নিখুঁত ঐশী কিতাব?' বব ডিলানের বাংলা করে সুমন যেভাবে গেয়েছে, সেভাবেই বলি- 'প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও তো জানা।' উত্তর হচ্ছে- মোটেই কোরাণ অলৌকিক কোন গ্রন্থ নয়। কোরাণে আসলে কোথাও বিগ-ব্যাং এর কথা

[†] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন - The Flat-out Truth: The idea of a spinning globe is only a conspiracy of error that Moses, Columbus, and FDR all fought... http://www.lhup.edu/~dsimanek/fe-scidi.htm

[‡] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন -The International Square Earth Society, http://pw1.netcom.com/~rogermw/square_earth.html

নাই, রিলেটিভিটির কথা নাই, কৃষ্ণগহ্বরের কথা নাই, অণু-পরমাণুর কথাও নাই। বিগ-ব্যাং আর রিলেটিভিটির নামে যা দেখছি, তা হল আদিম সূরাগুলির 'আধুনিক' এবং 'চতুর' ব্যাখ্যা। নীচের উদাহরণ টি দেখা যাক-

> 'অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না, আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম' (আম্বিয়া ২১:৩০)

'মহাবিজ্ঞানময় কিতাব-বিশেষজ্ঞ' এর দল এই আয়াতটির মধ্যে বিগ-ব্যাং এর গন্ধ খুঁজে পান। কিন্তু আসলেই কি এর মধ্যে বিগ-ব্যাং এর কোন আলামত আছে? একটু যৌক্তিক মন নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই আয়াত আর তার পরবর্তী আয়াতগুলের দিকে তাকানো যাক -

> 'আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম' (আম্বিয়া ২১:৩০)
>
> 'এবং আমি এ জন্য পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যেন তা সহ এটি না নড়ে।' (আম্বিয়া ২১:৩১)
>
> 'এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ' (আম্বিয়া ২১:৩২)
>
> 'আল্লাহ ই উর্ধ্ব দেশে স্তম্ভ ছাড়া আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন' (রা'দ ১৩:২)

এই আয়াতগুলি আমাদের আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যকার সম্পর্কে আসলে খুব প্রাচীন আর অস্পষ্ট একটি ধারণা দেয়। আল্লাহ আকাশকে 'স্তম্ভ বিহীন' ছাদ হিসেবে স্থাপন করার পর পৃথিবীতে পর্বত মালা স্থাপন করলেন যাতে কিনা আমাদের এ পৃথিবী না নড়ে, ঠিক যেমনটি আমরা পাতলা কোন কাগজ বাতাসে উড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ওটাকে পেপার-ওয়েট দিয়ে চাপা দেই। আল্লাহ মানুষের মাথায় 'আকাশ ভেংগে পড়ার' হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কি করলেন ? আকাশকে অদৃশ্য খুঁটির উপর বসিয়ে দিলেন। এগুলো কি করে বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলামত হয়? আর সবচেয়ে বড় কথা, 'আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম' - এই আয়াতটি যদি মহা-বিস্ফোরণের (বিগ-ব্যাং) এর প্রমান হয়, তবে কোথায় এখানে বিস্ফোরণের উল্লেখ? 'বিগ-ব্যাং' শব্দটি নিজেই এখানে তাৎপর্যবাহী। এই আয়াতের কোথায় রয়েছে সেই বিখ্যাত 'ব্যাং' (বিস্ফোরণ)-এর ইঙ্গিত?

উপরন্তু, পদার্থবিজ্ঞানে 'বিগ ব্যাং' স্থান-কাল অদ্বিতীয়ত্বের (space-time singularity) সাথে জড়িত, পদার্থের সাথে নয়। বিগ-ব্যাং এর প্রক্রিয়া যখন শুরু হয়েছিল তখন পৃথিবীর অস্তিত্বই ছিল না, পৃথিবীর জন্ম হয়েছে বিগ ব্যাং এর কোটি কোটি বছর পরে। উপরের আয়াতটি শুধু আকাশ ও পৃথিবী একসাথে 'মিশে থাকার' (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে যার কোন অর্থই হয় না) কথাই বলছে আর পরে বলছে উভয়কে 'পৃথক করে' (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে আবারও যার কোন অর্থ নেই) দেওয়ার কথা যা মূলতঃ 'হযবরল' ছাড়া আর কিছুই নয়, বিগ ব্যাং তো অনেক পরের কথা।

কাজেই কতগুলি অর্থহীন শব্দমালা -'আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম' কখনই বৈজ্ঞানিকভাবে 'বিগ ব্যাং'কে প্রকাশ করে না[§]। কোয়ান্টাম পদার্থ-বিজ্ঞান থেকে আমরা জানি, মহাবিস্ফোরণ-মুহূর্তে প্রকৃতির

[§] আসলে কোরানে কেন আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে থাকার কথা আছে তা সহজেই অনুমেয়। আসলে সে সময় প্যাগানসহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক গোত্রের উপকথা এবং লোককথাতেই আকাশ আর পৃথিবী মিশে থাকার আর হরেক রকমের দেব-দাবী দিয়ে পৃথক করার কথা বলা ছিল। যেমন মিশরের লোককথায় 'গেব' নামের এক দেবতা ছিলেন যিনি ছিলেন মৃত্তিকার দেবতা। এই গেবকে তার মা এবং বোন (আসমানের দেবী) থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ফলেই আকাশ আর পৃথিবী একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আবার, সুমেরীয় উপকথা গিলগামেশের কাহিনীতেও আসমানের দেবী 'অ্যান'কে মৃত্তিকার দেবতা 'কী' এর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার কথা বলা আছে। এ সমস্ত উপকথা থেকে প্যাগান রেফারেন্সগুলো বাদ দিলে যা রইবে, তা কোরাণেরই কাহিনী।

চারটি বল- শক্তিশালী নিউক্লিয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল, তড়িৎ-চুম্বকীয় বল আর মধ্যাকর্ষণ বল 'একীভূত শক্তি' (super force) হিসেবে প্রকৃতিতে বিদ্যমান ছিল। উপরের আয়াটিতে কোথায় তার ইঙ্গিত? কিভাবে একজন ওই আয়াতটি থেকে হাবলের ধ্রুবক বের করতে পারবে? কি ভাবে মাপতে পারবে ডপলারের বিচ্যুতি? উত্তর নেই।

জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষনার দিকে খানিকটা চোখ বুলানো যাক। অ্যালেন গুথ এবং লিন্ডের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফল থেকে জানা গিয়েছে, আমাদের মহাবিশ্ব যদি কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে স্থান-কালের শূন্যতার ভিতর দিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকে, তবে এ পুরো প্রক্রিয়াটি কিন্তু একাধিকবার ঘটতে পারে, এবং হয়তো বাস্তবে ঘটেছেও। ব্যাপারটিকে বলে মাল্টিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা। এ ধারনায় মনে করা হয়, কেওটিক ইনফ্লেশনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত বুদ্বুদ (Expanding Bubbles) থেকে আমাদের মহাবিশ্বের মতই অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে, যেগুলো একটা অপরটা থেকে সংস্পর্শবিহীন অবস্থায় দূরে সরে গেছে। এ ধরনের অসংখ্য মহাবিশ্বের একটিতেই হয়ত আমরা অবস্থান করছি (পকেট মহাবিশ্ব) অন্য গুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারেই জ্ঞাত না হয়ে।

কাজেই, বিজ্ঞানের চোখে বিগব্যাংই শেষ কথা নয়। বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো বিগব্যাং-এর আগে কি ছিল তারও একটি সার্বিক উত্তর খুঁজতে সচেষ্ট হয়েছে। আসলে ইনফ্লেশন বা স্ফীতি নিয়ে আঁদ্রে লিন্ডে আর তার দলবলের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে সত্যিকার অর্থেই সেই 'উত্তপ্ত বিগ ব্যাং' - যার মধ্য দিয়ে এ মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, তাকে বিদায় জানানোর সময় এসে গিয়েছে। কারণ, সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, বিগ ব্যাং দিয়ে মহাবিশ্বের শুরু নয়, বরং মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে ইনফ্লেশন দিয়ে। অর্থাৎ, বিগব্যাং এর পরে ইনফ্লেশনের মাধ্যমে মহাবিশ্ব তৈরী (যা কিছুদিন আগেও সত্যি বলে ভাবা হত) হয়নি, বরং ইনফ্লেশনের ফলশ্রুতিতেই কিন্তু বিগব্যাং হয়েছে, তারপর সৃষ্ট হয়েছে আমাদের মহাবিশ্ব । আঁদ্রে লিন্ডের কথায়[**] :

> '১৫ বছর আগেও আমরা ভাবতাম ইনফ্লেশন হচ্ছে বিগব্যাঙের অংশ। এখন দেখা যাচ্ছে বিগ ব্যাং-ই বরং ইনফ্লেশনারী মডেলের অংশবিশেষ।'

এখন কথা হচ্ছে, বিগব্যাং -এর মডেল কখনো ভুল প্রকাণিত হলে কিংবা পরিবর্তিত / পরিশোধিত হলে কি হবে? সাথে সাথে কি ধার্মিকেরাও বিগব্যাং-এর সাথে 'সঙ্গতিপূর্ণ' আয়াতকে বদলে ফেলবেন? তাহলে তখন 'আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল' -এই আপ্তবাক্যের কি হবে? এই ধরণের আশংকা থেকেই কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন বিশ্বাসী পদার্থবিজ্ঞানী আব্দুস সালাম জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের বিগ ব্যাং তত্ত্বকে কোরানের আয়াতের সাথে মিশাতে বারণ করতেন। তিনি বলতেন[††],

> 'বিগব্যাং তত্ত্বের সাম্প্রতিক ভাষ্যটি বর্তমানে মহাবিশ্বের উৎপত্তির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করছে। কিন্তু আগামীকাল যদি এর চাইতেও কোন ভাল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহলে কি হবে? তাহলে কি নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তাল মেলাতে গিয়ে ধর্মগ্রন্থের আয়াত বদলে ফেলা হবে?'

খুবই যৌক্তিক শঙ্কা। ঠিক একই কারণে ১৯৫১ যখন Pope Pius XII বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের মিল খুঁজে পেলেন, তখন জ্যোর্তিবিজ্ঞানী এবং খ্রীষ্টান ধর্মযাজক জর্জ হেনরি লেমিত্রি (যিনি 'বিগ ব্যাং' প্রতিভাসের একজন অন্যতম প্রবক্তা) পোপকে বিনয়ের সঙ্গে এ ধরনের যুক্তিকে 'অভ্রান্ত' হিসেবে প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই পরামর্শ মানছে কে?

[**] Self Reproducing Inflationary Universe, Andrei Linde, Scientific American, 1998

[††] Aparthib Zaman, Mixing Science with Religion, Mukto-Mona

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ওই অনলাইন পত্রিকাটিতে অধ্যাপক ভদ্রলোকের সাথে বিতর্কের কারণে কোরাণ এবং কোরাণ-বিশেষজ্ঞদের কথা বারে বারে উঠে এসেছে বলে এমন ভাবার কোন কারণ নেই যে অন্যান্য ধর্মের 'কিতাব বিশেষজ্ঞের দল' এই অভিযোগ থেকে মুক্ত। এরা কেউই আসলে ধোয়া তুলসি-পাতা নয়; বরং, একই মূদ্রার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। কিছু হিন্দু ভাববাদী 'বৈজ্ঞানিক' আছেন, যারা মনে করেন মহাভারতে কৃষ্ণ অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছে তা আসলে বিগ-ব্যাং ছাড়া কিছু নয়। মৃণাল দাসগুপ্ত ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমীর বিখ্যাত বিজ্ঞানী। উনি দাবী করেন, আজ আধুনিক বিজ্ঞান যে সমস্ত নতুন তত্ত্ব ও তথ্য প্রতিদিনই আবিস্কার করছে, তার সবকিছুই নাকি প্রাচীনকালের মুণি ঋষিরা বের করে গেছেন। বেদে নাকি সে সমস্ত আবিস্কার 'খুবই পরিস্কারভাবে' লিপিবদ্ধ আছে। মিঃ দাসগুপ্তের ভাষায়, রবার্ট ওপেনহেইমারের মত বিজ্ঞানীও নাকি গীতার বিশ্বরূপ দর্শনে এতই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে ল্যাবরেটরীতে আণবিক শক্তির তেজ দেখে নাকি গীতা থেকে আবৃত্তি করেছিলেন-

'দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ ভাসস্তস মহাত্মনঃ'

বিজ্ঞান জানা কিছু শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবি আছেন যারা ভাবেন আধুনিক বিজ্ঞান আজ যা আবিস্কার করছে তা সবই হিন্দু পূরাণ গুলোতে লিপিবদ্ধ জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি। হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন তাদের মুখপত্র 'উদ্বোধন' এ বলা শুরু করেছে যে, কৃষ্ণ গহ্বর কিংবা সময় ধারণা নাকি মোটেই নতুন কিছু নয়। হিন্দুধর্ম নাকি অনেক আগেই এগুলো জানতে পেরেছিল। কিভাবে ? ওই যে বহুল প্রচারিত সেই আপ্তবাক্যে -'ব্রহ্মার এক মুহূর্ত পৃথিবীর সহস্র বছরের সমান'। কিছু ধর্মবাদীর দৃষ্টিতে মহাভারতের কাল্পনিক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল আসলে এক 'পারমাণবিক যুদ্ধ' (Atomic War)। প্রশান্ত প্রামানিক নামে ভারতের এক 'জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক' তার 'ভারতীয় দর্শনে আধুনিক বিজ্ঞান' বইয়ে তার কল্পনার ফানুসকে মহেঞ্জোদাড়ো পর্যন্ত টেনে নিয়ে বলেছেন -'সম্ভবত দুর্যোধনেরই কোন মিত্র শক্তি পারমাণবিক যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে থাকবে মহেঞ্জোদাড়োতে' (পৃঃ ৬)। 'সবই ব্যাদে আছে' মার্কা এই সব বকচ্ছপ ভাববাদীরা অবলীলায় দাবী করে ফেলেন যে, নলজাতক শিশু (test tube baby) আর বিকল্প মা (surrogate mother) আধুনিক বিজ্ঞানের দান মনে করা হলেও তা হিন্দু সভ্যতার কাছে নাকি নতুন কিছু নয়। দ্রোণ-দ্রোনী, কৃপ-কৃপীর জন্মের পৌরাণিক কাহিনীগুলি তারই প্রমাণ। এমনকি কিছুদিন আগে উপসাগরীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত স্কাড আর প্যাট্রিয়ট মিসাইল নাকি হিন্দু পুরাণে বর্ণিত 'বরুন বাণ' আর 'অগ্নিবাণ' বই কিছু নয়। তারা সব কিছুতেই এমনতর মিল পেয়ে যান। যেমনি ভাবে ভারতের 'দেশ' এর মত প্রগতিশীল পত্রিকায় ২২ এপ্রিল ১৯৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিজ্ঞান ও ভগবান' নিবন্ধের লেখক হৃষীকেশ সেন বেদান্তে বর্ণিত উর্ণনাভ বা মাকড়শার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মান্ডের মডেলের মিল পেয়ে গেছেন।

খ্রীষ্টান সমাজেও এই ধরনের 'হাসজারু' প্রচেষ্টা বিরল নয় । বিজ্ঞানী - ফ্রাঙ্ক টিপলার - পদার্থবিজ্ঞানে অবদানের জন্য ইদানিং যত না বিখ্যাত, তার চেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছেন খ্রীষ্টধর্মকে 'বিজ্ঞান' বানানোর জন্য। ওমেগা পয়েন্ট নামে একটি তত্ত্ব দিয়েছেন টিপলার যা মহাসংকোচন (বিগ ক্রাঞ্চ)-এর সময় সিংগুলারিটির গানিতিক মডেলকে তুলে ধরে। এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু টিপলার মনে করেন এই ওমেগা পয়েন্টই হচ্ছে 'গড'। শুধু তাই নয়, যীশুর অলৌকিক জন্মকে (ভার্জিন বার্থ) তিনি বৈজ্ঞানিক বৈধতা দিতে চান যীশুকে বিরল xx male বানিয়ে, যীশুর পুনুরুত্থানকে ব্যারন এনিহিলেশন প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করেছেন, ইনকারনেশন বা অবতারকে বলেছেন বিপরীতমুখি ডিম্যাটারিলিজেশন পদ্ধতি, ইত্যাদি। এ সমস্ত রং-বেরং এর গালগপ্প নিয়েই নিয়েই তার সাম্প্রতিক বই The Physics of Christianity (2007)! বলা বাহুল্য মাইকেল শারমার, ভিক্টর স্টেংগর, লরেন্স ক্রাউস সহ অনেক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকই টিপলারের যুক্তিকে খন্ডন করেছেন[‡‡], কিন্তু তাতে অবশ্য আধুনিক 'বিজ্ঞানময়' খ্রীষ্ট-ধর্মোন্মাদনা থেমে যায়নি, যাবেও না। ফ্রাঙ্ক টিপলারের অনেক আগে ১৯৭৫ সালে ফ্রিজোফ কাপরা একই

[‡‡] বিস্তারিত তথ্যের জন্য পাঠকেরা পড়ুন অধ্যাপক ভিক্টর স্টেংগরের 'In The Name Of The Omega Point Singularity' (Free Inquiry 27. No. 5 August/September 2007) ; এবং ডঃ লরেন্স ক্রাউসের 'More dangerous than nonsense' (New Scientist, 12 May 2007)।

মানসপটে লিখেছিলেন ‘The Tao of Physics’ - প্রাচ্যের তাওইজমের সাথে বিজ্ঞানকে জুড়ে দিয়ে। চীনের প্রাচীন দার্শনিকেরা ইন এবং য়্যান (yin and yang) নামে পরস্পরবিরোধী কিন্তু একইভূত সত্ত্বার কথা বলেছিলেন - মানুষের মনে ভাল-মন্দ মিলেমিশে থাকার প্রসঙ্গে। ফ্রিজোফ কাপরা সেই ইন এবং য়্যানকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলেন কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার জগতে - পদার্থের দ্বৈত সত্ত্বার (dual nature of matter) বর্ণনা হাজির করে - পদার্থ যেখানে কখনো কণা হিসেবে বিরাজ করে কখনো বা তরঙ্গ হিসেবে । আধুনিক পদার্থবিদ্যার শূন্যতার ধারনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন তাওইজমের ‘চী’ (ch'i or qi)-এর সাথে -

> ‘যখন কেউ জানবে যে, মহাশুন্য ‘চী’ দিয়ে পরিপূর্ণ, তখনই কেবল সে অনুধাবণ করবে, শুন্যতা বলে আসলে কিছু নেই।‘

মুক্তমনার বিশিষ্ট সদস্য অপার্থিব জামান ধর্মগ্রন্থের মধ্যে ‘বিজ্ঞান খোঁজার’ এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন -

> ‘প্রায়শঃই ধর্মবাদীরা ধর্মগ্রন্থের একটি নির্দিষ্ট আয়াত বা শ্লোকের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান কে খুঁজে পান। এটি একটি হাস্যকর অপচেষ্টা। ওমনিভাবে খুঁজতে চাইলে যে কোন কিছুতেই বিজ্ঞান কে খুঁজে নেওয়া সম্ভব। যে কোন রাম-শ্যাম-যদু-মধু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের অনেক আগে কোন কারণে বলে থাকতে পারে -‘সব কিছুই আসলে আপেক্ষিক’। কিন্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের পর সেই সমস্ত রাম-শ্যাম-যদু-মধুরা যদি দাবী করে বসে এই বলে -‘হু ! আমি তো আইনস্টাইনের আগেই জানতাম আপেক্ষিক তত্ত্বের কথা’ তবে তা শুধু হাস্যকর ই নয়, যে সমস্ত নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানীরা তাদের শ্রমলব্ধ গবেষণার মাধ্যমে নিত্য-নতুন আবিস্কারে পৃথিবীবাসীকে উপকৃত করে চলেছেন, তাদের প্রতি চরম অবমাননাকরও বটে। সবাই জানে, আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের জন্য আইনস্টাইনকে কখনই কোন ধর্মগ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়নি, বরং আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের পর পর ই তা ধর্ম বাদীরা নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে জুড়ে দেওয়ার জন্য নানা জায়গায় মিল খুঁজে পেতে শুরু করলেন। বলা বাহুল্য, আধুনিক বিজ্ঞান যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দানে এখনও অক্ষম, সেই সমস্ত জায়গায় ধর্মবাদীরাও কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। যেমন, বিজ্ঞান এখনও নিশ্চিতভাবে জানে না যে আমাদের এই মহাবিশ্ব বদ্ধ, খোলা নাকি ফ্ল্যাট। তাই ধর্মবাদীদেরও কেউ তাদের ঐশী কিতাব থেকে আমাদের জন্য ভবিষ্যতবাণী করে কোন ধরনের আলোকপাত করতে পারছেন না। কিন্তু আমি নিশ্চত যে, বিজ্ঞানের কল্যাণে কখনও যদি এর উত্তর বেরিয়ে আসে, তবে সাথে সাথে ধর্মবাদীরা বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের কতকগুলি অস্পষ্ট আয়াত অথবা শ্লোক হাজির করে এর অতিপ্রাকৃততা দাবী করবেন। মূলতঃ প্রতিটি ক্ষেত্রেই (গোঁজা)মিলগুলি পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলি প্রকাশ পাওয়ার পর, তার আগে নয়। এ কি স্রেফ ঘটনার কাকতালীয় সমাপতন?’

আমি অপার্থিবের মন্তব্যের সাথে সামগ্রিকভাবে একমত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্মগ্রন্থে ‘আধুনিক বিজ্ঞানের’ সন্ধান পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলো প্রকাশ পাওয়ার পর, তার আগে নয়। কারণ বিজ্ঞানের দায় পড়ে নি ধর্মগ্রন্থ থেকে সবক নিয়ে আলোর সন্ধান লাভ করতে, বরং ধর্মগুলোই জেনে গেছে, বিজ্ঞান ছাড়া তারা টিকে থাকতে পারবে না। কাজেই, নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলোকে ধর্মগ্রন্থের সাথে জুরে দেবার জন্য ধর্মবাদীরা এখন মুখিয়ে থাকে। একটা সময় বাইবেল-বিরোধী সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রকাশের জন্য কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, ব্রুনোর উপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়েছিল বাইবেল-ওয়ালারা, সেই তারাই এখন বাইবেলের নানা জায়গায় সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের ‘আলামত’ পেয়ে যান। কোরানের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার খাটে। কিছুদিন আগেও দেখতাম অনেকেই ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে রীতিমত জ্বিহাদ শুরু করেছিলেন কোরানের আয়াতকে উদ্ধৃত করে, আজকে যখন বিবর্তনতত্ত্বের স্বপক্ষের প্রমাণগুলো এতই জোরালো হয়ে উঠেছে যে, সেগুলোকে আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না। তাই শুরু হয়েছে বিবর্তনবাদের স্বপক্ষে আয়াত খোঁজা। পেয়েও গেছেন কিছু কিছু। একটা ওয়েব সাইটে দেখলাম, ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে যে, কোরাণের ৪:১, ৭:১১, ১৫:২৮-২৯, ৭৬:১-২ প্রভৃতি

আয়াতগুলো নাকি বিবর্তন তত্ত্বের 'সরাসরি' প্রমাণ। এ সমস্ত আয়াতে 'সৃষ্টি' বোঝাতে 'খালাকা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'গ্র্যাজুয়াল চেঞ্জ' - অতএব - 'ইহা ইভল্যুশন'। আমার অনুমান - আর কয়েক বছরের মধ্যে শুধু ইভ্যলুশন নয়, অচীরেই তারা মাল্টিভার্স, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন, স্ট্রিং তত্ত্ব, প্যাঙ্গপারমিয়া, জেনেটিক কোড, মিউটেশন - এ ধরণের অনেক কিছুই তারা ধর্মগ্রন্থে পেয়ে যাবেন (কিছু কিছু হয়ত এর মধ্যেই পেয়েও গেছেন)। তবে এ ধরণের সমন্বয়ের জব্বর খেলা দেখিয়েছে হিন্দু ধর্মবাদীরাই। যখন বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে ফ্রেডরিখ হয়েল, হারমান বন্দি আর জয়ন্ত নারলিকার মিলে স্থিতিশীল মহাবিশ্ব তত্ত্বের (Steady state theory) অবতারনা করেছিলেন, তখন তা ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, কারণ এটি বেদে বর্ণিত 'চির শাশ্বত' মহাবিশ্বের ধারণার সাথে মিলে যায়। কিন্তু মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের (Cosmic background radiation) খোঁজ যখন বিজ্ঞানীরা পেলেন, তখন তা স্থিতিশীল মহাবিশ্বকে হটিয়ে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব বা বিগ ব্যাং-কে বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দিল। হিন্দুত্ববাদীরাও সাথে সাথে ভোল পালটে 'চির শাশ্বত' মহাবিশ্ব বাদ দিয়ে 'অদ্বৈত ব্রহ্ম'-এর খোঁজ পেয়ে গেলেন। অর্থাৎ, মহাবিশ্বের সৃষ্টি থাকুক, না থাকুক, চিরশ্বাশ্বত হোক আর না হোক, স্থিতশীল হোক আর অস্থিতিশীলই হোক - সবই কিন্তু তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে।

ধর্মবাদীদের গোঁজামিল দেওয়ার এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা (সঠিক ভাবে বললে বলা উচিত 'অপচেষ্টা') দেখে প্রবীর ঘোষ তার 'কেন আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না' বইতে খুবই মজার একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন -

> 'ধরা যাক, রাস্তার একটি মাতালকে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মডেল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। মাতালটি হয়ত রক্ত-চোখে প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে থেকে রাস্তা থেকে পড়ে থাকা মদের বোতলটি তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে গলায় মদ ঢালতে শুরু করল। তারপর অবশেষে শুন্য বোতলটি রাস্তায় ফেলে দিয়ে হেঁটে চলে গেল। পুরো ব্যাপারটিকে কিন্তু ইচ্ছে করলেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সাথে গোঁজামিল দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায়। মদের বোতলটি যখন পূর্ণ ছিল, সেই অবস্থাটিকে আমাদের এখনকার প্রসারণশীল মহাবিশ্বের সাথে তুলনা করা যায়। মাতালটি গলায় মদ ঢেলে বোতল খালি করতে শুরু করল এই বোঝাতে যে, এক সময় বিশ্বের এই প্রসারণ থেমে যাবে আর শুরু হবে সংকোচন। শেষ পর্যন্ত মাতালটি শুন্য বোতল রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে এটাই বোঝাতে চাইছে যে মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে হতে পূর্বের সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করে সিংগুলারিটি বিন্দুতে চলে আসবে।'

কী আদ্ভুত 'মহা-বিজ্ঞান ময়' নির্বুদ্ধিতা ! বাংলাদেশে বেশ ক'বছর ধরেই চলছে এই নির্বুদ্ধিতার খেলা, মাতাল সাজার আর মাতাল বানানোর নিরন্তর প্রক্রিয়া। এখানে 'জ্ঞানের কথা', 'লজ্জা' 'নারী'র মত প্রগতিশীল বই অবলীলায় নিষিদ্ধ করা হয় মানুষের 'ধর্মানুভূতি' তে আঘাত লাগবার অজুহাতে, আরজ আলী মাতুব্বরের 'সত্যের সন্ধান' আর দেবী প্রসাদ চৌধুরীর 'যে গল্পের শেষ নেই' পড়ার অপরাধে মুক্তিযোদ্ধা ওহাবকে 'জুতোর মালা' পরিয়ে সারা গ্রাম ঘোরানো হয়, তসলিমাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়, মুক্ত বুদ্ধির চর্চা করার জন্য আহমেদ শরীফ-আলী আসগর-কবীর চৌধুরী দের 'মুরতাদ' ঘোষনা করা হয়, চাপাতির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয় মুক্তমনা অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদকে, আর অপরপক্ষে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামিক ফাউন্ডশন থেকে বের করা হয় 'Scientific Identification in Holy Quran' এর মত ছদ্ম-বিজ্ঞানময় গ্রন্থ। ভক্তি-রসের বান ডেকে অদৃষ্টবাদ আর অলৌকিকত্বের রমরমা বাজার তৈরী করতে চলছে বুকাইলী-মুর-দানিকেনদের বইয়ের ব্যাপক প্রচার আর প্রসার। বাংলাদেশের সারা বাজার এখন 'আল-কোরাণ এক মহা বিজ্ঞান', 'মহাকাশ ও কোরাণের চ্যালেঞ্জ', 'বিজ্ঞান না কোরাণ', 'বিজ্ঞান ও আল কোরাণ' জাতীয় ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক বই এ সয়লাব। এ বছর মুক্তমনা এবং শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের যৌথপ্রয়াসে প্রকাশিত 'স্বতন্ত্র ভাবনা' (চারদিক, ২০০৮) বইটির ভুমিকায় উদ্ধৃত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অজয় রায়ের একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি,

> 'জ্ঞানের একমাত্র উৎস যদি পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলি হয়, তাহলে সেই সমাজে নেমে আসবে বন্ধ্যাত্ব, সমাজ হবে জড় চেতনা-চিন্তায় আচ্ছন্ন, সৃষ্টিশীলতার স্থান দখল করবে কুসংস্কার, মূর্খতা, কুপমন্ডুকতা আর অজ্ঞানতা। আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে কুসংস্কার আর প্রযুক্তিবিদ্যার ফসলকে আত্মস্থ করার পারস্পরিক সহাবস্থান। বিজ্ঞানের যুক্তি চাই না, চাই তার ফসল, পাশে থাক অন্ধবিশ্বাস আর ভাগ্যের কাছে

আত্মসমর্পন। এই সমাজেই সম্ভব - ড্রয়িং রুমে রঙ্গিন টেলিভিশন সেট স্থাপন, এবং হিস্টিরিয়া-আক্রান্ত কন্যাকে পীরের চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরণ। এই সমাজেই সম্ভব- অনুরসায়নবিদদের রসায়ন চর্চার পাশাপাশি তথাকথিত পীরের পদচুম্বন।'

সত্যই তাই। অদ্ভুত উটের পিঠে সত্যি ই বুঝি চলেছে স্বদেশ। বিজ্ঞানের এই অগ্রগামীতার যুগে প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের বাঁধন ক্রমশঃ যখন শিথিল হয়ে পড়ছে, মানুষের মনে দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের সংশয় আর প্রশ্ন, তখনই ধর্ম কেন্দ্রিক নিবর্তন মূলক শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখার মতলবে শুরু হয়েছে এক নতুন ধরনের নিরন্তর মগজ ধোলাই। আর তা হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের মোড়কে মুড়ে ধর্মকে পরিবেশন। কিছু মানুষ রসাল চাটনির মত তা খাচ্ছে ও বেশ। ধর্মের নেশায় বুঁদ হয়ে মানুষ ভাবতে শিখছে ১৪০০ বছর আগে লেখা 'বিজ্ঞান ময়' কিতাবে সত্যিই বুঝি মহা-বিস্ফোরণের কথা আছে, অথবা প্রাচীন কোন শ্লোকে আছে কাল প্রসারণের ইঙ্গিত। কে দেবে এই মোহান্ধ জাতিকে মুক্তি? ওমর খৈয়ামের একটি কবিতার কথা খুব মনে পড়ছে -

যদি মাতালের শিক্ষাকেন্দ্র মাদ্রাসাগুলো
এপিকিউরাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের দর্শন-শিক্ষালয় হত,
যদি পীর দরবেশের আস্তানা ও মাজারগুলো
গবেষণা প্রতিষ্ঠান হত,
যদি মানুষ ধর্মান্ধতার পরিবর্তে
নীতিজ্ঞানের চর্চা করত,
যদি উপাসনালয়গুলো সর্ববিদ্যাচর্চা-কেন্দ্র
হিসাবে গড়ে উঠত,
ধর্মতত্ত্বের চর্চার পরিবর্তে যদি গণিত বীজ-গণিতের
উন্নতি সাধন করত,
ধর্ম যা মানবজাতিকে বিভক্ত করে তা
'মানবতা'র দ্বারা প্রতিস্থাপিত হত,
পৃথিবী তাহলে বেহেস্তে পরিণত হত,
পরপারের বেহেস্ত বিদায় নিত,
প্রেম-প্রীতি মুক্তি-আনন্দে জগৎ পরিপূর্ণ হত নিঃসন্দেহে।

ওমর খৈয়াম বহু বছর আগে যে কথা বলেছিলেন, বাংলাদেশের জন্য সেকথা গুলো আজও কি নিদারুন সত্য ! স্বতন্ত্র ভাবনায় ড. অজয় রায় যে ভাবে লিখেছিলেন, তার সাথে সুর মিলিয়ে আমাদেরও বলতে ইচ্ছে করে - ওমর তুমি আর একবার আস এই দেশে, কুসংসারে আচ্ছন্ন এই দেশে, ফতোয়াবাজদের এই দেশে আজ তোমার বড় প্রয়োজন।

***

(প্রবন্ধটি ৯ ই ডিসেম্বর ২০০২ সালে মুক্তমনা সহ বেশ কয়েকটি ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়। এর ইংরেজী সংস্করণটি infidels.org এর 'ইসলাম' বিভাগে রাখা আছে। 'বিজ্ঞান ও ধর্ম - সংঘাত নাকি সমন্বয়?'- মুক্তমনার পরবর্তী প্রকাশিতব্য সংকলন-গ্রন্থের জন্য মে ২০, ২০০৮ এ সামান্য পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত)

ড. অভিজিৎ রায়, মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ও 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com